প্রথম আলো

কলাম

বিশ্লেষণ

ঢাবি ক্যাম্পাসে যান নিয়ন্ত্রণের আসল উদ্দেশ্য কী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি আর দশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এটি ঢাকা শহরের বাইরে বা কোনো প্রান্তে অবস্থিত নয়, একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এই ক্যাম্পাসের মধ্য দিয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বেশ কটি রাস্তা চলে গেছে, যে রাস্তাগুলো দিয়ে নগরবাসী এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতায়াত করেন। এ রকম অবস্থায় ঢাবি ক্যাম্পাসে যান নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা কতটুকু, তা নিয়ে লিখেছেন **কল্লোল মোস্তফা**

কল্লোল মোস্তফা

প্রকাশ: ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪, ১২: ০৭

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গিয়েছিলাম একটা কাজে। সিএনজি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা গেল না, হেঁটে প্রবেশ করতে হলো। দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথগুলোতে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। সেখানে কয়েকজন তরুণ বহিরাগত যানবাহন পরীক্ষা করে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যানবাহনগুলোকে প্রবেশ করতে দিচ্ছে। ফলে প্রবেশপথগুলোতে সব সময়ই যানবাহনের একটা জটলা লেগে থাকছে, যা চারপাশের রাস্তায় বিদ্যমান যানজট আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

সেই সন্ধ্যায় ঢাবি ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকে পরিবেশটা কেমন অদ্ভুত লেগেছিল। স্বৈরশাসক হাসিনার শাসনামলেও আন্দোলনবিহীন দিনে ঢাবিতে এ রকম পরিবেশ দেখিনি। বর্তমান এই পরিস্থিতির কারণ হলো, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ক্যাম্পাসে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, শুক্র, শনি ও সরকারি ছুটির দিনগুলোয় বেলা ৩টা থেকে রাত ১০টা এবং কর্মদিবসে বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকবে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত গাড়ি, জরুরি সেবা (অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার, রোগী, সাংবাদিকসহ অন্যান্য সরকারি গাড়ি) ছাড়া অন্য কোনো যানবাহন ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকতে পারবে না।

এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি প্রবেশপথে ব্যারিকেড দিয়ে যানবাহন প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। পথগুলো হলো শাহবাগ, দোয়েল চত্বর, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিট, শিববাড়ি ক্রসিং, ফুলার রোড, পলাশী মোড় ও নীলক্ষেত। এ সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ‘সার্বিক নিরাপত্তার’ কথা বলা হয়েছে।

বহিরাগত নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি নতুন নয়

ঢাবি ক্যাম্পাসে বহিরাগত নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি অবশ্য নতুন নয়। এর আগের সরকারের আমলেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় বহিরাগত প্রবেশ বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে; বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সময়। ২০১৮ সালের জুলাই মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন চলার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা প্রক্টরের অনুমতি ছাড়া ক্যাম্পাসে ‘বহিরাগতদের’ অবস্থান, ঘোরাফেরা ও কার্যক্রম পরিচালনায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন।

এ বছরের জুলাইয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলন চলার সময়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার’ কারণ দেখিয়ে ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। তখন অবশ্য কোটা সংস্কার আন্দোলনরত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে বহিরাগত ব্যক্তিদের ঢাবি ক্যাম্পাসে আসার আহ্বান জানানো হয়েছিল। সে সময় ছাত্রলীগ ও পুলিশি হামলা মোকাবিলার জন্য তাদের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে প্রায়ই ‘রাজুতে আসার’ আহ্বান জানানো হতো।

সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তটি বহিরাগতদের প্রবেশে পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা না হলেও বাইরের মানুষকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসতে নিরুৎসাহিত করার জন্যই নেওয়া। এ প্রসঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোনো প্রতিবাদ বা আপত্তি চোখে পড়েনি। হয়তো এখন আর ‘বহিরাগত’ সাধারণ মানুষদের তাদের ‘প্রয়োজন’ নেই।

কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত কতটা যৌক্তিক

প্রশ্ন হলো শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা বলে বিকেল থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত যানবাহন প্রবেশ করতে না দেওয়াটা কতটা যৌক্তিক?

প্রথমত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি আর দশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এটি ঢাকা শহরের বাইরে বা কোনো প্রান্তে অবস্থিত নয়, একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এই ক্যাম্পাসের মধ্য দিয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বেশ কটি রাস্তা চলে গেছে, যে রাস্তাগুলো দিয়ে নগরবাসী এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতায়াত করেন। ক্যাম্পাসের এক প্রান্তে হাসপাতাল আর আরেক প্রান্তে রয়েছে বাণিজ্যিক এলাকা।

কাজেই বিকেলের ব্যস্ত সময়ে এই রাস্তাগুলোতে যানবাহন প্রবেশ করতে না দেওয়ার অর্থ হলো নগরবাসীর চলাচলের পথে বাধা তৈরি করা, যা করার এখতিয়ার ঢাবি কর্তৃপক্ষের কতটুকু আছে, সেটা একটা প্রশ্ন। এমনকি সংরক্ষিত এলাকা হওয়া সত্ত্বেও ক্যান্টনমেন্ট দিয়ে যান চলাচলেও এ রকম নিষেধাজ্ঞা নেই। গাড়ি বা সিএনজি নিয়েই ক্যান্টনমেন্টের মধ্য দিয়ে বনানী থেকে কচুক্ষেতে যাতায়াত করা যায়।

দ্বিতীয়ত, জনগণের করের অর্থে পরিচালিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার জায়গাই নয়, এটি একটি পাবলিক স্পেস বা জনপরিসরও বটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পাশে ঢাকা মেডিকেল ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ভেতরে বাংলা একাডেমি, পরমাণু শক্তি কমিশন, ব্রিটিশ কাউন্সিল।

কার্জন হলের উল্টো দিকেই রয়েছে হাইকোর্ট। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র বা টিএসসির পাশেই রয়েছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। এর সব কটিই পাবলিক স্পেস বা জনপরিসর।

ক্যাম্পাসের ভেতরে অনেক মিলনায়তনে নিয়মিত সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বইমেলা, পয়লা ফাল্গুন, পয়লা বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারিসহ বিভিন্ন উপলক্ষে সারা বছরই নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও জনসমাগম হয় এখানে। ক্যাম্পাসের ভেতর-বাইরের বিভিন্ন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, নাগরিক ও রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যেখানে ‘বহিরাগতদের’ যাতায়াত রয়েছে।

প্রতিদিন বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত বাইরে থেকে যানবাহন নিয়ে প্রবেশ করতে না দেওয়ার অর্থ হলো নানা শ্রেণি-পেশা ও বয়সের মানুষের জন্য এসব জনপরিসর ব্যবহারে বাধা তৈরি করা এবং তাদেরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসতে নিরুৎসাহিত করা।

প্রশ্ন উঠেছে, প্রাইভেট কার বা মোটরসাইকেলে যাঁরা চলাচল করেন, তাঁরা ঢাবি ক্যাম্পাসে প্রবেশের বেলায় মোটরসাইকেল বা গাড়ি কোথায় রেখে আসবেন? রিকশা বা সিএনজি করে যাঁরা আসবেন, তাঁদের রিকশা বা

সিএনজি থেকে নেমে হেঁটে ভেতরে যেতে হবে বা নতুন করে রিকশা খুঁজতে হবে। যাঁদের হাঁটাচলায় সমস্যা আছে বা যাঁরা বয়স্ক, তাঁদের বেলায় করণীয় কী হবে?

ঢাকায় জনপরিসরের এমনিতেই সংকট রয়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে ঢাবির মতো বিশাল ও বহুমুখী একটি জনপরিসরকে সাধারণ মানুষের জন্য এভাবে নিরুৎসাহিত করা গ্রহণযোগ্য নয়।

তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষসহ কেউ কেউ যুক্তি হিসেবে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও পড়াশোনার পরিবেশের কথা বলছেন। কিন্তু বাইরের মানুষ কবে, কোন দিন ঢাবিতে নিরাপত্তা সমস্যা তৈরি করল? বরং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যত অপরাধ হয়, তার সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীদের যুক্ত থাকতে দেখা গেছে, যাঁরা এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র।

২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছয় বছরে ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মারামারিসহ বিভিন্ন অপরাধের বিভিন্ন ঘটনায় ছাত্রলীগের অন্তত ৪৫ জন নেতা-কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয় এবং হল থেকে স্থায়ী ও সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছিল। ২০২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরাধের ৩৮ ঘটনায় ছাত্রলীগের নাম এসেছিল। এসব ঘটনায় বরং বাইরের মানুষকে বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের দ্বারা হয়রানির শিকার হতে দেখা গেছে।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় দিনের বেলায়, সন্ধ্যা বা রাতের বেলায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক, তা পরিষ্কার নয়। সন্ধ্যায় কেউ গাড়ি, সিএনজি বা রিকশায় ঢাবির মধ্য দিয়ে যাওয়া সিটি করপোরেশনের রাস্তা দিয়ে শাহবাগ থেকে শহীদ মিনার বা ঢাকা মেডিকেল কলেজে চলাচল করলে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বা পড়াশোনার পরিবেশ কীভাবে বিঘ্নিত হয়, সেটা স্পষ্ট নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে নিরাপত্তার কারণ দেখানো হলেও প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ ক্যাম্পাসে বিকেলে সাধারণ মানুষের ‘হ্যাংআউট’ ঠেকানোর উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। তিনি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, ‘ক্যাম্পাসে সকালের দিকে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করতে আসে এবং এখানে দুটি স্কুল ও কিছু ব্যাংক থাকায় সকালে দাপ্তরিক কাজেই মানুষ ক্যাম্পাসে আসে। কিন্তু বিকেলের দিকে হ্যাংআউটের উদ্দেশ্যেই ক্যাম্পাসে মানুষ বেশি আসে। সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যেই এই সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে বিকেলে যে ভিড় দেখা যায়, সে সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করছি।’

কাজেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকেল বা সন্ধ্যায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য আসলে কী, সেটা নিয়ে জনমনে নানা সন্দেহ তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে এমন মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের কাছে ঢাবি ক্যাম্পাসে নানা ধরনের মানুষের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হয়তো পছন্দ না। কিন্তু সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে প্রবল প্রতিক্রিয়া

হবে, তাই নিরাপত্তা ও পড়াশোনার পরিবেশের কথা বলে মানুষের যাতায়াতে বাধা তৈরি করে এসব কর্মকাণ্ড নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

আর এতে মনে হয় কাজও হচ্ছে। নিজেদের কথাই বলি। সামনের এক শনিবার বিকেলে আনু মুহাম্মদ সম্পাদিত রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিশ্লেষণমূলক ত্রৈমাসিক জার্নাল *সর্বজনকথা*র পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের এক মিলনায়তনে সেমিনার আয়োজন করার পরিকল্পনা ছিল।

*সর্বজনকথা*র সম্পাদকমণ্ডলীর একাধিক সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অনেকেই জার্নালটির পাঠক, শুভানুধ্যায়ী। সেই হিসেবে ঢাবি ক্যাম্পাসে সেমিনার আয়োজন অস্বাভাবিক কিছু নয়, এর আগেও এ রকম সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু ঢাবি ক্যাম্পাসে বহিরাগত যান চলাচলে সাম্প্রতিক এই বাধাবিপত্তির মধ্যে অতিথিদের যাওয়া-আসার সমস্যার কথা বিবেচনায় নিয়ে এই সেমিনারটি ঢাবি ক্যাম্পাস এলাকার বাইরে কোথাও করার সিদ্ধান্ত নিতে হলো।

ক্যাম্পাসে যান চলাচলে বাধা বহাল থাকলে অনেকেই হয়তো এ রকম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন। আর এটাই হয়তো বর্তমান ঢাবি প্রশাসনের উদ্দেশ্য।

কী প্রভাব পড়তে পারে

ঢাবি কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে যে ঢাকার যানজট সমস্যাই বাড়বে বা নাগরিকেরা গুরুত্বপূর্ণ একটি জনপরিসর থেকে বঞ্চিত হবেন শুধু তা-ই নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও। শিক্ষার্থীদের কাছে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের এই উদ্যোগকে শিক্ষার্থীবান্ধব হিসেবে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করা হলেও দীর্ঘ মেয়াদে এটা শিক্ষার্থীদের জন্য কল্যাণকর হবে না। ঢাবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নগরবাসীর সম্পর্কের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হবে এবং নানা রকম বিরোধ সৃষ্টি হবে।

তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞান সৃষ্টির একটি জায়গা। এর জন্য নানা মত ও পথের মানুষের তর্কবিতর্ক, আলাপ-আলোচনা, আড্ডা, সংস্কৃতিচর্চার জন্য মুক্ত পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বহিরাগত ব্যক্তিদের ভিড় বা ‘হ্যাংআউট’ ঠেকানোর নামে ঢাবি ক্যাম্পাসে ‘বদ্ধ’ একটি পরিবেশ তৈরি করা হলে তা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্যও ভবিষ্যতে নেতিবাচক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

- **কল্লোল মোস্তফা** লেখক ও গবেষক

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৪ প্রথম আলো